

লোককথা প্রান্তিক মানুষের অন্যতর ভাষা

কাকলী ধারা মণ্ডল

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার পাঁচ রানী-বড় রানী, মেজো রানী, সেজো রানী, ন-রানী আর ছোট রানী। কিন্তু রাজার মনে ভারী দুঃখ। কেন জানো? ছেলে পুতে হয়নি যে! রাজা তাই সব সময় একথাই ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবে আমি মরে গেলে এত বড় রাজ্যের রাজা কে হবে? মন্ত্রী-সেনাপতি-পাত্র-মিত্র সবার মনে এই একই প্রশ্ন! রাজা কত বদিকে দেখিয়েছে, কত মন্দিরে মানত করেছে, তবু রানীদের কোল শূন্যই থেকে গেছে। দিন যায়, রাজ্যের প্রজারাও মনের দুঃখে কাটায়। এমন ভালো রাজা, তিনি মরে গেলে তাদের যে কি হবে! তারপর একদিন এক ফকির এল রাজদরবারে। রাজা খুব যত্ন করে তাকে বসালো, অনেক উপহার, সোনার মোহর সব দিল। ফকির কিছু নিল না, বললো, রাজা, আমি তো ফকির। এসব নিয়ে কি করবো? আমি এসেছি তোমার দুঃখের কথা শুনে। এই বলে ফকির তার ঝোলা থেকে একটা শশা বের করলো, শশাটা প্রায় আধ হাত লম্বা এবং তার গা দিয়ে জ্যোতি বের হচ্ছে! ফকির বললো এই শশা ঝোঁটা সমেত পাঁচ রানীকে ভাগ করে দিতে। তাহলেই পাঁচ রানীই পুত্রসন্তান লাভ করবে। ব্যাঙ রাজপুত্র ও বানর রাজপুত্রের এই গল্প প্রায় সকলেই ছোটবেলায় শুনেছে। এমন গল্প আমরা কেউ ঠাকুমা, কেউ দিদিমা, বাবা, মা, পিসিমা, মাসিমা, কাকিমা কিম্বা দাদুদের কাছে ছোটবেলায় অনেক শুনেছি। এমন গল্পে শৈশবে আমাদের কল্পনার রাজ্যে রামধনু রঙ খেলে যেত। তখন কে জানতো এদের বলে লোককথা! লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক যুগে এইসব মৌখিক পরম্পরা ‘ভার্বাল আর্ট’ নামে লোকসংস্কৃতির সমার্থক ছিল। প্রজন্ম পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও হস্তান্তরিত, স্মৃতি ও ঋতি বাহিত এইসব গল্প বা কথা বা কাহিনি আকারে খুব ছোট হতে পারে, যেমন এই দুই মিনিটেই শেষ হয়ে গেল, আবার এমন বড় হতে পারে যে তা শেষ করতে কয়েকদিন লেগে গেল! আরব্যরজনীর গল্পের কথা আমরা সবাই জানি, একহাজার একদিন মানে প্রায় তিনবছর ধরে বলা সেই শিকলি গল্প এমনতরও হতে পারে। এইসব গল্প একক ও সরলরৈখিক যেমন হতে পারে, আবার অজস্র শাখা প্রশাখা সম্বলিত জটিল কাহিনিও হতে পারে। সাধারণত মৌখিক রূপে বারংবার বলা হয়ে এসেছে এইসব কাহিনি। তবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বহু লোককথা বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণের প্রয়োজনেই লিখিত রূপ লাভ করেছে।

লোকসংস্কৃতির যে পাঁচটি বর্গ তার মধ্যে প্রথম বর্গটি হল বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা মৌখিক পরম্পরা বা মৌখিক সাহিত্য (oral literature or oral expression) যার অন্যতম প্রাচীন উপাদান এই গদ্যাকারে বর্ণিত লোককাহিনি।

লোককথায় এক বা একাধিক মোটিফ থাকে। মোটিফ হল কাহিনির এক ক্ষুদ্রতম অংশ যা বিশেষ কোন ঐতিহ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে। এ প্রসঙ্গে একটু পিছনে ফিরে যাই—ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ফিনল্যান্ডে এক বিশেষ সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় শিকড়ের আত্মানুসন্ধানের তাগিদে। হেলসিন্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক কার্লে ক্রোণ (যিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতির জনক জুলিয়াস ক্রোণের

পুত্র) তাঁর কিছু তরুণ অধ্যাপক বন্ধু যথা অক্ষার হ্যাকম্যান, এক্সেল ওল্ট্রিক, জোহানেস বোল্ট ও সি ডব্লু ফন সাইডো প্রমুখকে এবং তাদের কিছু গবেষক ছাত্রদের নিয়ে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গড়ে তুলেছিলেন ফিনিস লিটারেরি সোসাইটি।

এঁরাই উদ্যোগ নেন এক বৃহৎ প্রকল্পের। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এঁরা আবেদন জানান এই প্রকল্পে সহায়তা করে নিজের নিজের ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে তাঁদের কাছে পাঠাতে। সেই সঙ্গে হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গবেষক ও ছাত্রকেও বৃত্তি দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে পাঠানো হল লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করতে। লক্ষ লক্ষ সংগৃহীত উপাদানের মধ্যে কয়েক হাজার লোককথাও সংগৃহীত হল। এইসব লোককথার গবেষণা ও বিশ্লেষণের জন্য কার্ল ক্রোণ তাঁর ছাত্র তথা অধ্যাপক অ্যান্টি আর্নেকে দায়িত্ব দিলেন এগুলোর শ্রেণিবিন্যাস (classification) করার। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর প্রবল পরিশ্রমেও এই কাজ সম্পূর্ণ হল না। ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হল। ক্রোণ দায়িত্ব দিলেন সিথ টমসনকে। ১৯২৬ সালে সিথ টমসন আর্নের টাইপসূচি সংক্রান্ত এই কাজকে পরিপূর্ণ করেন এবং এই সূচিটি পরবর্তী কালে ‘আর্নে-টমসন টাইপ সূচি’ (Index) নামে পরিচিত হয়। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত “The Type of the Folktales” লোককথার শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এক পথ প্রদর্শনকারী (pioneer) কাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। টাইপসূচি শুধু লোককথার নির্দিষ্ট ধরনটিকেই চিহ্নিত করলো তা নয়, একটি বিশেষ লোককথার সম্ভাব্য উৎস স্থল, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, তার ‘আদি পাঠ’ বা ‘আর্কিটাইপ’, ‘অন্যতর পাঠ’ বা ‘অইকোটাইপ’ ইত্যাদি নির্ধারণ করার কাজও সহজতর করে দিল। যে কোন গল্পের একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র যে মেজাজ—সেটাই তার টাইপ। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি টাইপেরই সন্ধান মেলে যা ওই গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা, পরিবেশ ও সমাজ মনস্তত্ত্বের (socio-psychology) প্রতিফলক।

এতো গেল টাইপের কথা। শুরু করেছিলাম মোটিফের কথা দিয়ে। টাইপের কাজ করার সময়ই আর্নে লোককথার এই ক্ষুদ্রতম এককগুলিকে লক্ষ্য করেন এবং তা লিখেও যান। সিথ টমসন হাজার হাজার লোককথার মধ্যে অসংখ্য মোটিফ খুঁজে পেলেন যা ১৯৩০ সালে বিপুলাকার ছয়টি ভল্যুমে ‘Motif Index’ নামক গ্রন্থ প্রয়াসে আত্মপ্রকাশ করলো। টমসনের মতে, “A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual & striking about it.” — অর্থাৎ লোককথার মধ্যে কিছু অসাধারণ ও আকর্ষণীয় মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান থাকে যা ঐতিহ্যের মধ্যে বেঁচে থাকে — কথকের প্রভাবে, কালের প্রভাবে কিংবা স্থানান্তরের ফলেও যা পরিবর্তিত হয় না। A থেকে Z পর্যন্ত এই মোটিফ সূচী মোট ২৩টি ভাগে বিভক্ত (O, I এবং Y বাদ) আবার প্রত্যেক মোটিফের অন্তর্গত ১০০ টি উপবিভাগ আবার প্রতিটি উপবিভাগের অন্তর্গত ১০ টি করে প্র-উপবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। ক্যাটাগরি B সংখ্যক motif হল জীবজন্তু বিষয়ক; B.1, B.2 বাঘ, শিয়াল; B.1.1 বোকাবাঘ ইত্যাদি।^১ লোককথাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ভাবে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। লোককথার বিষয় (theme), গঠন (structure), রূপ (form) কিংবা অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ (meaning) ইত্যাদির বিচারে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াকিল আহমেদ এভাবে ভাগ করেছেন—

- ১) রূপকথা (Fairy Tales)
- ২) ব্রতকথা (Religious Tales)
- ৩) পশুকথা / উপকথা (Animal Tales)
- ৪) রোমাঞ্চকর গল্প (Novella)

- ৫) বীর কাহিনি (Hero Tales)
- ৬) সন্ত কাহিনি (Sage Tales)
- ৭) পুরাকাহিনি (Myth)
- ৮) লোকপুরাণ (Legend)
- ৯) নীতিকথা (Fables)
- ১০) হাস্য ব্যঙ্গের গল্প (Humourous Tales)
- ১১) ব্যাখ্যা দানকারী গল্প (Explanatory Tales)^২

যদিও এই শ্রেণিবিভাগ নিয়েও অসংখ্য মতভেদ আছে। সাধারণ ভাবে আমাদের বাংলার প্রেক্ষাপটে এছাড়াও ভূতের গল্প, ডাকাতির গল্প, শিকারের গল্প, আজগুবি বা গুলিখোরের গল্প—এরকম আরও বেশ কিছু পরম্পরাগত বিচিত্র বিষয়ক লোককথা বাংলার লোকঐতিহ্যে প্রচলিত আছে। রূপকথা বলতে রাক্ষস-খোকস, দতি-দানো, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, পরী কিংবা জিনসহ কাল্পনিক অসংখ্য চরিত্র, রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যাসহ জমজমাট এক গল্প বা মূলতঃ ইচ্ছাপূরণের। যেখানে ভালোদের জয় আর মন্দদের পরাজয়ের নির্দিষ্ট ফর্মুলা অনুসৃত হয়। দক্ষিণারঞ্জন সহ ঠাকুমার বুলিতে এমনই রূপকথা পাই। পশু কথায় জীবজন্তুরাই মূলচরিত্র, যেমন বাঘ, শিয়াল, কুমীর ইত্যাদির গল্প। আবার যেসব জীবজন্তুর গল্পে উপদেশ থাকে সেগুলোকে নীতিকথা বা ‘ফেবল’ বলে। বাংলায় হিতোপদেশ বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র এমনই ‘ফেবল’। মিথ হল সৃষ্টি বিষয়ক বা ব্যাখ্যামূলক কাহিনি—মানুষ কি করে সৃষ্টি হল, কেন সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়, কেন ভূমিকম্প হয়—আদিম মানুষ এ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতো না, তাই নিজের মত করে কিছু ব্যাখ্যা করে নিতো। প্রাক-বিজ্ঞানের যুগে বা বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী যুগের মানুষের নিজস্ব ভাবনাপ্রসূত ব্যাখ্যামূলক কাহিনিই ‘মিথ’। যেমন রাহু আর কেতুর সেই গল্পতো সবাই জানে। চন্দ্র আর সূর্যকে রাহু আর কেতু দুই অসুর গিলে নেয় বলেই না চন্দ্র গ্রহণ/সূর্য গ্রহণ হয়! তাহলে লিজেড কোনগুলি? কিংবদন্তী বা লিজেড হল ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি বা স্থান বা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচলিত কোন ক্ষুদ্রাকার লোককথা। সাধারণত কোন বিষয় যার মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে, তারপর তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে গল্প, যার সবটুকু কিংবদন্তী। যেমন তানসেনের দীপক রাগ গেয়ে আলো জ্বালাবার বা মেঘমল্লার গেয়ে বৃষ্টি আনার গল্প। আর ব্রতকথা হল নির্দিষ্ট আচার—কৃত্যগত অনুশঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোককথা। আর রঙ্গরসের উৎস হল চুটকি বা রঙ্গকথা (Jokes & anecdotes) —যেমন গোপাল ভাঁড়, বীরবল, মোল্লা নাসিরুদ্দিন এমনকী আজকের দিনেও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এমন অসংখ্য চুটকি বা Jokes নিরন্তর আমোদের মাধ্যম হয়ে ওঠে (পাঞ্জাবীদের বোকামি, বাঙ্গালীদের বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি)। লোককথার এই বিপুল সম্ভার দেশে দেশে কালে কালে নিত্য বহমান। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার এর মতে—

“মানুষ এসব কাহিনি বলে চলেছেন সেই কোন ভুলে যাওয়া কাল থেকে। সন্ধ্যার সূর্য ডোবার মুহূর্তে সারাদিনের ক্লাস্তি শেষে তারা যখন লোককথা বলেন তখন নিজের জীবন ও সামাজিক পরিবেশের না-মেটা আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাপূরণ নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।”^৩

এবার আসা যাক লোককথার রচয়িতা, শ্রোতা এবং কথকের প্রসঙ্গে। তারাও ‘লোক’ বা ‘folk’ — তারা mass / people বা জনগণ। সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ হয়েও তারা ‘প্রান্তিক’ (Sub-altern) — জাতিগত, পেশাগত, শ্রেণীগত, বর্ণগত কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক বিচারে তারা ‘Social exclusion’-এর শিকার। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজে তথা গোষ্ঠীর মধ্যে এই যে সব লোককথা প্রচলিত হয়ে আসছে প্রজন্ম পরম্পরায় তা

আপাতভাবে নিরীহ কিছু কাহিনি, অলস কল্পনার রোমান্টিক বিস্তরণ—কিছু শিশু ভোলানো মজাদার ব্যাপার স্যাপার মনে হলেও তার অন্তর্কাঠামোয় থেকে যায় ‘Collective mind’-এর নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব।

শুরু করি একটি প্রচলিত শিশু ভোলানো পশুকথা দিয়ে। গল্পটা সবার জানা—সেই যে একটা খরগোশ ছিল—বনের পশুরাজ সিংহর খাদ্য হয়ে তার গুহায় যেতে হবে—খরগোশ বুদ্ধি করে দেরী করে গেলে—সিংহ রেগে আগুন—ছংকার দিয়ে বলল ‘তোরা এত সাহস! আমার কাছে আসিস দেরী করে!’ খরগোশ বলল ‘মহারাজ রাস্তায় আর এক পশুরাজ আমার পথ আটকেছিল, তাতেই এত দেরী’। তাই নাকি? কার এত সাহস আমার রাজ্যে তোরা পথ আটকায়? ইত্যাদি—গল্পের শেষটাও আমাদের সবার জানা—কুয়োর মধ্যে নিজের ছায়া দেখে বোকা সিংহ লাফ দেয়, জলে ডুবে মারা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে যদিও সিংহ বোকা প্রাণী এমন তথ্য আমরা কোথাও পাই না, খরগোশ যে কিনা গর্তে মুখ ঢুকিয়ে ভাবে আমাদের কেউ দেখতে পারছে না—সে এমন বুদ্ধিমান হয়ে উঠল কী করে এসব প্রশ্ন লোককথার রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যতর ভাষাটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক—আসলে আকারে ক্ষুদ্র ক্ষমতায় দুর্বল এই খরগোশ সেই ‘Socially exclusive’ ‘প্রান্তিক’ সমাজের প্রতিনিধি। মার্কসের বয়ানে ‘শোষিত শ্রেণির’ প্রতিভূ। আর বিশালাকার প্রবল শক্তি সম্পন্ন সিংহ সমাজের ‘Creamclass people’ বা শাসক শ্রেণির বা বলাভালো শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। বাস্তবজীবনে চিরটাকাল পড়ে পড়ে মার খাওয়া — শোষণে জর্জরিত হতে হতে সমাজের প্রান্ত দেশ থেকে মূলস্রোতের বাইরে চলে যাওয়া। বাস্তবে তার প্রতি অবিচারের কোন প্রতিকার নেই। তাই গল্পের মধ্যে গল্প রচয়িতা শোধ নেয়। জিতিয়ে দেয় নিজেরই আত্মরূপ খরগোশকে। সিংহকে শুধু পরাজিত করে নয়, হত্যা করে শাস্তি পায়। এভাবেই কল্পিত পশুকথায় বিম্বিত হয় সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিরোধ-পদ্ধতি (Defence Mechanism)।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সংগৃহীত আর একটি চমৎকার পশুকথা এ প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করছে—সেই যে নরহরি দাসের গল্প, ছোট্ট ছাগলছানা যার গায়ে শক্তি নেই, মায়ের অনুপস্থিতিতে জঙ্গলে গিয়ে রাত হয়ে গেলে যে শিয়ালের গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল। শিয়াল ফিরে এসে যখন জিজ্ঞেস করলো গর্তে কে রে? উত্তর দিল ছাগল—

‘লম্বা লম্বা দাড়ি। ঘন ঘন নাড়ি

সিংয়ের মামা আমি নরহরি দাস

পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস।’^{৪৮}

এক আধটা নয় এক গ্রাসে পঞ্চাশটা বাঘ খায় সে, একথা শুনে শিয়াল তো পড়ি মড়ি করে ছুটে বাঘের কাছে কেঁদে পড়ল। শুনে টুনে বাঘ গেল ক্ষেপে। করে ব্যাটা নরহরি দাস? চল দেখাচ্ছি মজা! শিয়াল তো কিছুতেই যাবে না, শেষে তাকে ফেলে পালাবে না এই আশ্বাস দিয়ে লেজে বেঁধে বাঘ চলল। দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই ছাগল বলল—‘দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি, এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!’^{৪৯} শুনে বাঘ ভয় পেয়ে লাগালো লাফ, লেজে বাঁধা শিয়াল—দু’জনেরই খোঁচা খেয়ে কাঁটা খেয়ে অবস্থা শেষ। পুরো গল্পটা খুব সুন্দর। ছোটবেলায় এটা শুনে সব বাচ্চাই হেসে গড়াগড়ি খায়।

কিন্তু এ কী কেবলই এক বোকা বাঘ আর তার সাকরেদ শিয়াল আর চালাক ছাগলের মজাদার গল্প! নাকি বাঘ হল জোতদার-জমিদার-রাজা কিংবা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদেব প্রতিনিধি আর শিয়াল হলো এদের চামচা বা খামাখরা রাজনৈতিক নেতা যাদের তীব্র শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের ঘৃণার প্রকাশ! বাস্তবে যে ভক্ষকের উৎপীড়নের কোন প্রতিবাদই করতে পারে না সে গল্পের মধ্যে তাকেই নাকানি চোবানি খাইয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। ফ্রয়েডের ভাষায় “It is a perfectly valid psychic phenomenon, actually a wish-

fulfilment.”^৬ এবং টিকে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অসহায় প্রান্তিক মানুষের উদবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এমন অবাস্তব সব গল্পের সৃষ্টি করেছিল! এমন অসংখ্য লোককথা পাই যেখানে বাঘ কিংবা সিংহকে এমনই সব ক্ষুদ্র প্রাণীরা পর্যুদস্ত করেছে। যেখানে টুনটুনি পাখি কৌশলে তার ছোট ছোট সন্তানদের শিকারী বিড়ালের শ্যেন দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছে। সেই যে টুনটুনি গল্পে বিড়াল যখন টুনটুনি ঘরের পাশে আসে তার ছানাদের খাবার জন্য, আর ‘পেন্নাম হই মহারানি’ শুনে খুশি হয়ে ফিরে যায়। প্রান্তিক মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এভাবেই গ্রামের মোড়ল, গোষ্ঠীপতি, রাষ্ট্রীয় জীবনে পুলিশ, আদালত, নেতা, সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, কারখানার মালিক, ইটভাটার ঠিকাদারদের খুশি রাখতে হয়, তারাও সুযোগ খোঁজে এমনি করে ফুরুৎ করে লোভি বিড়ালদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার—সামাজিক শোষণ, রাজনৈতিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, এমনকী যৌন শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েও মেলে না মুক্তি—গল্পের টুনটুনিরা তার হয়ে ‘act’ করে—যখন তার বাচ্চারা উড়তে শিখে তাল গাছে বসল, তখন ‘খানিক বাদেই বিড়াল এসে বলল, কী করছিসলা টুনটুনি?’ তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বলল, ‘দূর হ, লক্ষী-ছাড়ি বিড়ালনি!’ বলেই সে ফুডুৎ করে উড়ে পালাল। দুট্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।^৭

এই ভাবেই লোককথায় কথক বা রচয়িতা তার বেঁচে থাকার নিতান্ত প্রাথমিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে চায় রূপকের অন্তরালে। কোন চাহিদা? ফ্রয়েডের ভাষায় (১) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা (২) দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা (৩) হিংসার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শন ও প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষা (৪) বলশালীর বল প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ ও আত্মতৃপ্তি তথা শোষিতের উদ্বর্তন আকাঙ্ক্ষা—এসব চাহিদাই অসংখ্য লোককথায় ছদ্মবেশি চরিত্ররা তার হয়ে পূরণ করে।^৮

প্রান্তিক কথকের অভিজ্ঞতা বলে তার কথা কেউ শুনবে না। সে যে সর্বঅর্থেই দুর্বল! তাই তার কোন কাজ হয় না। এ তার দারিদ্রের শাস্তি! এ তার তথাকথিত ‘ছোটোজাতের’ বা ‘ছোটলোকের’ ঘরে জন্মাবার ‘শাস্তি’। সামাজিক সম্মান ও যোগাযোগ হীনতার ‘শাস্তি’। টুনটুনি ফেঁড়া হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছে—নাপিতকে গিয়ে অনুরোধ করলো—সামান্য ব্যাপার—ফেঁড়াটুকু কাটলেই পারতো—কিন্তু ঐ যে বললাম, সে যে শক্তিহীন, তাকে ‘ignore’ করেই শক্তিমানের আনন্দ!! নাপিত অপমান করে তাড়িয়ে দিল, রাজার কাছে নালিশ করলো!! রাজা হেসে উড়িয়ে দিল—রেগে গিয়ে ইঁদুরকে, বিড়ালকে, লাঠিকে, আগুনকে, সাগরকে, হাতিকে সবাইকে কত না হাতে পায়ে ধরলো—তার সমস্যা কেউ সাহায্য করলো না। শেষে ছোট্ট মশার কাছে কেঁদে পড়লো—মশা তার লক্ষ লক্ষ বন্ধুকে নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে হাতিকে আক্রমণ করলো। একটা মশা—দশটা মশা—একশটা মশা কামড়ালে কিছু যায় আসে না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ মশা যখন আকাশ ছেয়ে দিল তখন—

হাতি বলে, সাগর শুষি
সাগর বলে, আগুন নেবাই!
আগুন বলে লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে বিড়াল ঠ্যাঙাই
বিড়াল বলে ইঁদুর মারি
ইঁদুর বলে রাজার ভুঁড়ি কাটি
রাজা বলে, নাপতে ব্যাটার মাথা কাটি!

নাপিত হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘রক্ষা করো টুনিদাদা! এসো তোমার ফেঁড়া কাটি।’^{১৯} ক্ষুদ্রের সমষ্টিগত শক্তি এখানে বৃহৎকেও কাঁপিয়ে দিল। প্রতিনিয়ত প্রাস্তিক জীবন দেখে তাকে তুচ্ছ করার সামাজিক পরম্পরা—সে কাজ পায় না, সে সামনে এগোবার সুযোগ পায় না। গল্পের মধ্যে তাই সমাজের সর্বস্তরকে সে বাধ্য করে তার কাছে হাত জোড় করতে—প্রাপ্য পরিষেবাটুকু দিতে। তাই এই সব লোককথা আর যাইহোক, নিরীহ শিশু মনোরঞ্জন আবেল তাবোল ভাবনা বলে ভাবলে মস্ত ভুল হবে। মৌখিক ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে নিহিত আছে সমষ্টি মনের চেতন কিংবা অবচেতন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-ক্ষোভ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণতা!!

লোককথায় প্রাস্তিক মানুষের সমাজ মনস্তত্ত্ব যেমন নিহিত থাকে ঠিক তেমনি এমন অনেক বিষয় থাকে যা বহু কালের প্রাচীন কোন প্রথা কিংবা রীতি, যে পরম্পরা লোককথার মধ্যে জীবাস্থ হয়ে রয়ে যায়। যেমন নরবলির প্রথা, নরমাংসভক্ষণের রীতি (Cannibalism)। বহু লোককথায় আমরা এই নরবলির প্রসঙ্গ পাই যা প্রমাণ করে একসময় পূজাচারে নরবলির প্রথা ব্যাপকভাবে ছিল। মানব সমাজের সভ্যতা ভব্যতার বিপ্রতীপে এও অন্যতর ভাষ্য। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার পথর্যাভরা ব্রত অর্থাৎ পুকুর ভরা ব্রত পালন করা হয় চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে। এ অঞ্চল খরা প্রবণ, যাতে পুকুরে বা নদী নালা জলে ভরে যায় তার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। ব্রত কথাটি অতি সংক্ষেপে এরকম—একবার গ্রামে গ্রামে খুব জল কষ্ট হয়েছিল, সবাই মিলে জমিদারের কাছে কেঁদে পড়লো। জমিদার পুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। পুরোহিত বললো নরবলি দিতে হবে। তবেই সব জলাশয় জলে ভরে উঠবে। তারপর অনেক খুঁজে এক দরিদ্র আদিবাসী যুবককে রাজী করিয়ে তাকে বলি দিয়ে সেই রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হলো পুকুরে—সঙ্গে সঙ্গে পুকুর জলে ভরে উঠলো।^{২০}

নাটাই চণ্ডীর ব্রততেও দেখা যায় সওদাগরের মেয়ে বিয়ে হয়ে স্বশুর বাড়ি যাবে। তার পুত্রসন্তান হলে সেই পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন স্বশুর মশাই আগে থেকে কেটে রাখা দীঘিতে জল উঠছে না বলে ঐ নাতিকে কেটে তার রক্ত ছিটিয়ে দেয়, পুকুরে জল ওঠে। এদিকে সেই মেয়ে মা নাটাই চণ্ডীকে পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করে আবার বলি দেওয়া সন্তানকে ফিরে পায়। অর্থাৎ জলাশয়ে জল না উঠলে নরবলি দিয়ে সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলে পুকুর জলে ভরে যাবে এ ধরনের লোকবিশ্বাস একসময় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যা অসংখ্য লোককথার মধ্যে পাওয়া যায়। সংকটের ব্রততেও নরবলির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। নরবলির বহুল প্রচলন থাকলেও নরমাংস ভক্ষণের প্রথা বঙ্গদেশের কোথাও ছিল বলে শোনা যায় না। তবে মেঘালয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ছিল তার প্রমাণ লোককথায় পাওয়া যায়। ‘ফল কালিকাই’ নামে একটি জলপ্রপাতের মিথটি ‘ক্যানিবলিসম’ এর প্রমাণ। একটি খাসি মেয়ে, নাম কালিকাই, তার শিশু সন্তানকে স্বামীর কাছে রেখে কাজে যায়, এদের মাতৃ তান্ত্রিক সমাজ। মেয়েরা কাজ করে আর ছেলেরা ঘরের কাজ সামলায়। ফিরে এসে সন্তানের খোঁজ করে, তার স্বামী বলে ছেলে পাশের বাড়িতে আছে। মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে রান্না করা রুটি মাংস খায়। খাবার পর শিকিয়ে কাঁচা সুপরি খোঁজে—দেখে সেখানে ছোট ছোট আঙুল কাটা রাখা আছে। সে বুঝতে পারে তার স্বামী তাকে ছেলের মাংস খাইয়েছে। সে মনের দুঃখে পাহাড় থেকে বাঁপ দেয় আত্মহত্যা করার জন্য। ফলে সে ঐ বর্ণা হয়ে যায়। তাই এ কথা বলা যায় যে, লোককথায় বর্ণিত কোন প্রসঙ্গই অবাস্তব বা প্রক্ষিপ্ত নয়। সত্যিই নরমাংস ভক্ষণ একসময় এ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।^{২১}

সীমিত পরিসরের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই, তবু একটা বিষয় বলে ব্রতকথার প্রসঙ্গে ইতি টানতে চাই, জানা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ধানের চাষ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০০-৬০০০ অব্দে, যদিও তখন জংলী ভ্যারাইটি অসম ও নেপালে জন্মাতো। (যদিও পলি ভ্যালি রিজিয়ন চায়নাতে ৮২০০-১৩৫০০ বছর আগে এর চাষ হত)। যাইহোক, তার মানে ব্যাপক ভাবে চাষ হওয়া ও প্রধান খাদ্য শস্যে পরিণত হওয়ার আগে

এ অঞ্চলে ধানের বদলে অন্য কিছু চাষ হত। আমাদের অধিকাংশ ব্রতই ধানচাষকেন্দ্রিক কৃষি উৎসবকে ঘিরে। কিন্তু দু’ একটি ব্রতকথায় তিলের প্রসঙ্গ পাই যা থেকে প্রমাণ হয় যে তিলই একসময় এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যা আজও প্রান্তিক লোকসমাজের মৌখিক পরম্পরায় জীবন্ত হয়ে রয়ে গেছে। নৃবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মতে একসময় এ অঞ্চলে তিলের ছাতু, তিলের তেল, তিলের নাড়ু, তিলের পাটালি বা তিল থেকে প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বলি ভাদ্রলক্ষ্মীর ব্রতের কথা। এই গল্পে এক গরিব বিধবা রমণী তার ছেলেকে নিয়ে একটি গাছের তলায় থাকতো। গাছে থাকতো পেঁচা পেঁচি আর তাদের বাচ্চা। ছেলেটা যা খায়—পেঁচার বাচ্চাদেরও দেয়। তারা তুষ্ট হয়ে মাকে বলে। প্যাঁচা ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার ছেলেটিকে নিয়ে শস্যের দেবী মা লক্ষ্মীর কাছে নিয়ে যায়, শিথিয়ে দেয় ‘মা ধনদৌলত দিতে চাইলে নিবি না। বলবি আমার তিল ধুবড়ি চাই’। তিল ধুবড়ি হল তিলের পোটলা বা মৃৎপাত্র। যেমন লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ধান থাকে, বেতের ডোলে ধান থাকে। তারও আগে তিল ধুবড়ি তেমনি তিলসহ মৃৎপাত্র। তারপর তাদের অবস্থা ফেরে এই তিলধুবড়ির পূজা করে।

এছাড়া দ্বিতীয় গল্পটি চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথা—এ গল্পে আছে লক্ষ্মীনারায়ণ পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়েছেন তাঁদের বিমানে করে। নারায়ণ বিশেষ কাজে নামলেন আর লক্ষ্মীকে বিশেষ দিকে তাকাতে বারণ করলেন এবং বিমান থেকে নামতে বারণ করলেন। লক্ষ্মী শুনলেন না তিলফুল তুললেন। খেতের মালিক বামুন এসে লক্ষ্মীকে আটকালেন বললেন বারো বছর তিলসন খাটতে বা বাড়ির কাজ করতে হবে। তারপর অবশ্য মা লক্ষ্মীর কৃপায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের অবস্থা ফেরে।^{১২} কিন্তু সে সময় তিল যে বিশেষ খাদ্যশস্য ছিল তা প্রমাণিত হয়। জানা যায় তিল অন্যতম প্রাচীন খাদ্যশস্য যা চীন, গ্রীস, মিশরসহ ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিলের ছাতু, তিলের তেল এবং তিলকে দানাশস্য রূপে ব্যবহারের পরম্পরা যে একসময় ব্যাপকভাবে ছিল তা প্রমাণিত হয় এই সব ব্রতকথা থেকে। এখানেই মৌখিক ইতিহাস বা ‘oral history’ এর গুরুত্ব।

যে কোন গোষ্ঠীর ‘মিথ’ বা লোকপুরাণগুলি সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যবাহী। পৃথিবীর প্রাচীনতম পাঁচটি মহাকাব্য যথা গিলগামেশ, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি—এর উৎসবীজ হল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা মানুষের রচিত এই সব মিথকথা। যে জনজাতি বা গোষ্ঠী যত সমৃদ্ধ, তার মিথের ভাণ্ডার তত ঋদ্ধ। ভারতবর্ষ, মিশর, মেক্সিকো, গ্রীস, চীন, আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের মিথে সেখানকার লোকসমাজের হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস, সংস্কার, গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্ব, সমাজ ভাবনা ফসিল হয়ে আছে—এগুলোকে যত ভাঙা যাবে, বিশ্লেষণ করা যাবে—মানব সমাজের ইতিহাসের তত নূতন নূতন প্রকরণ উঠে আসবে।

শেষ করবো গদ্যাকারে বর্ণিত লোককাহিনির জনপ্রিয়তম বিভাগ রূপকথার প্রসঙ্গ দিয়ে। রূপকথায় ব্যক্তিমনের বহু সূক্ষ্ম ও জটিল উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটে। একদিকে সামাজিক শ্রেণি সম্পর্ক—রাজপুত্র-রাখাল বালক, রাজকন্যা-ঘুঁটেকুড়ুনির সন্তান, রাজা-ফকির, রাণী-দাসী অন্যদিকে এইসব চরিত্রের আয়নায় অবচেতন মনের বিচিত্র প্রত্যাশা ও তাদের অপূর্ণতার বোধ এক দ্বন্দ্বিকতার জন্ম দেয়। রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাফস-ডাইনী-পক্ষীরাজ ঘোড়া সহ অজস্র অবাস্তব চরিত্রের বহিঃসৌখ্যের আড়ালে মানুষের প্রত্যাশা-নৈরাশ্য, কামনা-হতাশা, কল্পনা ও বাস্তবের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বিকতায় ‘wish fulfillment’ এর বাধ্যতা। যে ভাবেই হোক মিলনাত্মক পরিণতি যেখানে প্রান্তিক মানুষের অবশ্যম্ভাবী চাহিদাও। বাস্তবের শাসক কিংবা শোষক নাস্তানাবাবুদ হয় প্রান্তিক মানুষের বর্ণনায়, বাস্তব জীবনের হতাশা আনন্দের প্রাপ্তিতে পূর্ণতা লাভ করে। আপাত নিরীহ হাস্যরসের আড়ালে সঞ্চিত থাকে তীব্র প্রতিহিংসা কিংবা ‘killer’s instirct’, লোককথার জগতকে তাই যতই মধুর, যতই রঙীন, যতই কল্পনার সুদূরপ্রসারী সুখানুভূতি বলে মনে হোক না কেন, গভীর বিশ্লেষণে সংবেদনশীল মন অনুভব করতে পারে তার অন্তরের অন্যতম ভাষ্যটিকে।।

সূত্রনির্দেশ :

- ^১ মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। ২০১২। বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র; ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৬৮, পৃষ্ঠা-১৩
- ^২ আহমদ, ওয়াকিল। ২০১০। লৌকিক জ্ঞান কোষ। গতিধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫১১
- ^৩ মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। ২০১২। লোককথা। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৬৮, পৃষ্ঠা-৯
- ^৪ রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। ১৯৬৪। টুনটুনির বই। মলয় প্রকাশনী; রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৩
- ^৫ তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
- ^৬ ভূঞা, ফাল্গুনী। বাংলার লোকসংস্কৃতি মনোস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ ও প্রয়োগ, সমকালের জীবন কাঠি। মায়াহাউড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃষ্ঠা-৩৫৫
- ^৭ রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। টুনটুনির বই। মলয় প্রকাশনী; রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৬
- ^৮ ভূঞা, ফাল্গুনী। বাংলার লোকসংস্কৃতি মনোস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ ও প্রয়োগ, সমকালের জীবন কাঠি। মায়াহাউড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৩৬৫
- ^৯ রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। টুনটুনির বই। মলয় প্রকাশনী; রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৮
- ^{১০} সরকার, মাধুরী। ২০১৯। ব্রত সমাজ ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপনি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১১২
- ^{১১} ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত—তথ্যদাতা-অনিরা খার্মোহ্লাং; বয়স-২৮, শিলং, মেঘালয়।
- ^{১২} মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। ২০১৩। মেয়েদের ব্রতকথা। সম্পাদনা, অমিত ভট্টাচার্য। পারুল প্রকাশনী; ৮/৩ চিত্তামনি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৩৬

ঋণস্বীকার :

- ^১ ভট্টাচার্য, আশুতোষ। ১৯৬৬। বাংলার লোকসাহিত্য চতুর্থ খণ্ড : কথা। ক্যালকাটা বুক হাউস; ১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২
- ^২ চট্টোপাধ্যায়, সৌগত। ২০১৫। লোককথার বর্ণমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
- ^৩ সিদ্দিকী, আশ্রাফ। ২০০৮। লোকসাহিত্য। নয়া উদ্যোগ; ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬
- ^৪ রায়, সব্যসাচী। ১৯৯২। ঈশপ গল্পসমগ্র। নির্মল বুক এজেন্সি; ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
- ^৫ পণ্ডিত, নারায়ণ। ১৯৯৪। হিতোপদেশ গল্পসমগ্র। নির্মল বুক এজেন্সি; ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
- ^৬ মজুমদার, আশুতোষ। ২০২২। মেয়েদের ব্রতকথা। দেব সাহিত্য কুটীর; ২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক,
লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ